بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২০শে আগস্ট, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় পুনরায় হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ আরম্ভ করেন।

তাশাহ্হুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র যুগের স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল; সে যুগে যেসব যুদ্ধাভিযান হয়েছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যার মধ্যে **জুনদায়ে সাবুর**-এর যুদ্ধও অন্যতম। **জুনদায়ে সাবুর** খুযিস্তানের একটি শহর; হযরত আবু সাবরা মুসলিম বাহিনী নিয়ে এই স্থানে গেলে সেখানে অবস্থানরত শত্রু-বাহিনী সকাল-সন্ধ্যা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শত্রুরা দুর্গে আবদ্ধ ছিল ও সুযোগমত মুসলমানদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করতো। শত্রু যখন বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় আসন্ন, তখন তারা কোন উপায়ে সন্ধিচুক্তি করার ফন্দি আঁটতে থাকে। একদিন যখন মুসলিম শিবির থেকে **মিকনাফ** নামক একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস পানি সংগ্রহের জন্য শিবিরের বাইরে যান তখন তারা আগ বাড়িয়ে তার সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। তারা তাকে বলতে থাকে— যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করাই কি ভাল না? আমরা আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে, শান্তির সাথে বসবাস করবো আর জিযিয়া বা কর প্রদান করবো আর তোমরা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করবে, ইত্যাদি। সেই মুসলমান দাস সরলমনে তাদের কথার সাথে সহমত প্রকাশ করেন। শত্রুরা চালাকি করে তখন দুর্গের ফটক খুলে দেয়। যখন মুসলিম সৈন্যদল আসে তখন শত্রুপক্ষ বলে বসে, তোমাদের সাথে তো আমাদের সন্ধি হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা আশ্চর্য হয়ে জানতে চায়— সন্ধি কখন হল আর কে করল? খোঁজ নিয়ে উপরোক্ত বৃত্তান্ত জানা গেল; মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান যেহেতু এভাবে শত্রুদের সাথে সন্ধি করায় একমত ছিলেন না, সেহেতু তিনি বিষয়টি মীমাংসার জন্য হযরত উমর (রা.)-কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) সিদ্ধান্ত দেন— ভবিষ্যতের জন্য ঘোষণা করে দাও যে, সর্বাধিনায়ক ছাড়া অন্য কেউ সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না; কিন্তু এটাও হতে পারে না যে, একজন মুসলমান কথা দিয়েছে আর আমি সেটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সিদ্ধান্ত দেব, তা সে একজন ক্রীতদাসই হোক না কেন! এভাবে তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে খুযিস্তানে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হযরত উমর (রা.) কেন ইরান জয় করেন, এর পেছনের কারণ কী— সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.)'র আন্তরিক বাসনা ছিল **ইরাক ও আহওয়াযের** যুদ্ধের মাধ্যমেই এই রক্তক্ষয়ের সমাপ্তি ঘটুক। শত্রু আক্রমণ করেছে, তাদেরকে একবার পরাজিত করা হয়েছে ও তাদের শক্তিকে প্রতিহত করা হয়েছে— এটাই যথেষ্ট। তিনি (রা.) বারংবার একথা ব্যক্তও করেছিলেন— ভালো হতো যদি তাদের ও আমাদের মাঝে এমন এক প্রতিবন্ধক থাকতো যা ডিঙিয়ে তারাও আসতে পারতো না আর আমরাও যেতাম না! কিন্তু ইরানীদের বারংবার সামরিক আক্রমণ তার এই অভিপ্রায় পূর্ণ হতে দেয় নি। **১৭ হিজরীতে** যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে হযরত উমর (রা.) তাদের কাছে জানতে চান, বিজিত অঞ্চলে কেন বারবার চুক্তিভঙ্গ ও বিদ্রোহ হচ্ছে? মুসলমানরা সেখানকার অধিবাসীদের ওপর কোন অন্যায়-অত্যাচার করছে না-তো? নেতৃবৃন্দ বলেন, মুসলমানরা তো পূর্ণ সততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে

সবকিছু করছে; তা সত্ত্বেও কেন এরূপ হচ্ছে— হযরত উমর (রা.)'র এই প্রশ্নের উত্তর দেন **আহনাফ বিন কায়স**। তিনি জানান, খলীফা মুসলমানদেরকে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু ইরানী স্ম্রাট তো এখনও জীবিত রয়েছে এবং যতদিন সে বেঁচে আছে, ইরানীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েই যাবে। এক বনে তো দুই বাঘ থাকতে পারে না; হয় এদেশে মুসলমানরা থাকবে, নতুবা ইরানীরা থাকবে। তাদের আক্রমণের প্রেক্ষিতেই সব যুদ্ধ হয়েছে ও দেশ জয় হয়েছে, মুসলমানরা তো আগ বাড়িয়ে একবারও যুদ্ধ করে নি! আহনাফ বিন কায়সের এই উত্তর স্পষ্ট করে দেয়— **মুসলমানরা কখনোই সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন নি; তাদের ওপর আক্রমণ হতো দেখে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে বাধ্য হতেন, তারই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ জয় হতো।** আহনাফ এ-ও বলেন, যদি অগ্রসর হয়ে ইরানী স্ম্রাটকে ইরান থেকে বিতাড়ন করা হয়, তাহলে এই যুদ্ধের ধারা অবসান হওয়া সম্ভব। হযরত উমর (রা.) সহমত প্রকাশ করেন এবং বাধ্য হয়ে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেন, তবে কার্যত তা করার অনুমতি আরও দেড়-দু'বছর পর ২১ হিজরীতে গিয়ে **নাহাওয়ান্দের** যুদ্ধের পর প্রদান করেন। **নাহাওয়ান্দ ছিল ইরানের একটি পর্বতবেষ্টিত শহর**। ইরান-ইরাকে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানগুলোর মধ্যে তিনটি যুদ্ধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল; **কাদসিয়ার যুদ্ধ, জালুলার যুদ্ধ ও নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ।** শেষোক্ত যুদ্ধটি তার ফলাফলের কারণে **ফাতহুল ফুতুহ বা সবচেয়ে বড় বিজয়** আখ্যায়িত হতো। ইরানী স্ম্রাট ইয়াযদাজারদে'র আহ্বানে সারাদেশ থেকে ইরানীরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য নাহাওয়ান্দে সমবেত হচ্ছিল; হযরত সা'দ (রা.)'কে যখন হযরত উমর (রা.) সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'কে এই দায়িত্ব প্রদান করেন, তখন হযরত সা'দ (রা.) মদীনায় ফিরে গিয়ে সাক্ষাতে খলীফাকে সেখানকার পুরো পরিস্থিতি অবহিত করেন। হযরত উমর (রা.) মজলিসে শূরার আয়োজন করেন এবং এক আবেগপূর্ণ ভাষণে সবার কাছে পরামর্শ আহ্বান করেন; দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে তিনি সংক্ষেপে পরামর্শ দিতে বলেন এবং স্বয়ং নিজে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন কি-না সে বিষয়েও সবার মতামত চান। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে বলেন, খলীফা গভীর ধীশক্তির অধিকারী, তিনি যা সমীচিন মনে করেন তা-ই সিদ্ধান্ত নিন, সবাই তার সাথে আছেন। কিন্তু উমর (রা.) আরও পরামর্শ চান। তখন হযরত উসমান (রা.) পরামর্শ দেন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও বসরায় অবস্থিত মুসলিম বাহিনীকে যেন ইরান যাবার নির্দেশ দেয়া হয়, আর খলীফা স্বয়ং হেজাযে অবস্থিত বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। অনেকেই এই পরামর্শে সহমত প্রকাশ করেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, যদি সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় তবে রোমানরা সিরিয়া এবং ইথিওপিয়ানরা ইয়েমেন দখল করে নেবে; খলীফার সাথে যুদ্ধে যেতে সব মুসলমানই উন্মুখ হবে এবং গোটা দেশ অরক্ষিত হয়ে পড়বে। তিনি পরামর্শ দেন, বসরার সৈন্যবাহিনী তিনভাগে বিভক্ত করে এক অংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার নিরাপত্তার জন্য ও এক অংশ বিজিত এলাকায় রেখে তৃতীয় অংশটি কূফায় প্রেরণ করা হোক; অনুরূপভাবে অন্যান্য স্থানের সৈন্যদলকেও তিনি এভাবে ভাগ ভাগ করে অংশবিশেষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, খলীফার স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ সমীচীন হবে না, কারণ খলীফা যুদ্ধে আসছেন জানতে পেরে ইরানীরাও পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধে আসবে; যদি খলীফার কিছু হয়ে যায় তবে ইসলামের অস্তিত্ব ও ঐক্য বিপন্ন হয়ে পড়বে। তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানদের প্রকৃত শক্তি তাদের সৈন্যসংখ্যা নয়, আসল শক্তি হল আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন;

অতীতেও এরূপই ঘটেছে এবং আল্লাহ্ চাইলে এবারও তা-ই হবে। হযরত উমর (রা.) তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেন এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করেন; তিনি হযরত **নু'মান বিন মুকাররিন (রা.)**'কে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে, কেউ কেউ **ষাট হাজার বা এক লক্ষ** বর্ণনা করলেও **বুখারীর ভাষ্যমতে শত্রুসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার**। তবে তারা যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। শত্রুপক্ষের সেনাপতি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আলোচনা করতে চাইলে মুসলিম শিবির থেকে হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) আলোচনা করতে যান। শত্রুদের সেনাপতি প্রভাব খাটিয়ে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে এবং কৌশলে মুসলমানদের উদ্যম ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার এই ফন্দি কোন কাজে লাগে নি। যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুদের অনুকূলে ছিল, তারা দুর্গ, পরিখা, দালান ইত্যাদির নিরাপদ আড়ালে ছিল; তারা তাদের ইচ্ছামত ও সুবিধেমত বেরিয়ে এসে আক্রমণ করতো। অপরদিকে মুসলমানরা ছিলেন উন্মুক্ত লক্ষ্যবস্তু। ফলে মুসলমানরা কোনভাবেই সুবিধে করে উঠতে পারছিলেন না। পরিস্থিতি দেখে **হযরত নু'মান বিন মুকাররিন** (রা.) একটি পরামর্শ সভা করেন যে, কীভাবে শত্রুকে যুদ্ধের উন্মুক্ত ময়দানে বের করে আনা যায়। বিভিন্ন রকম পরামর্শের পর তুলায়হা নামক একজন পরামর্শ দেন, একটি ছোট্ট দলকে অগ্রে পাঠানো হোক যারা দুর্গের কাছে গিয়ে তীর ছুঁড়তে থাকবে এবং যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করবে। ছোট্ট এই দলটিকে পরাস্ত করার জন্য শত্রুরা অগ্রসর হবে, তখন তারা পিছু হটার ভান করবে। অপরদিকে শত্রুরা জয়ের নেশায় নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকবে আর মুসলমানরা পিছু হটতে থাকবে; এভাবে টোপ দিয়ে তাদেরকে বের করে আনতে হবে। হযরত কা'কা-কে এই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। বাস্তবেও হুবহু এমনটিই হয়েছিল। হযরত নু'মান (রা.) স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দেন যে, তার নির্দেশের পূর্বে কেউ শত্রুদের ওপর আক্রমণ করবে না। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে মুসলমানদের অনেকেই আহত হন। হযরত নু'মান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে দুপুরের শেষদিকে মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন, এর পূর্বে তিনি একান্ত আবেগ নিয়ে দোয়া করেন যেন এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনি শাহাদত বরণ করতে পারেন। তাঁর অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্যে উজ্জীবিত মুসলিম বাহিনী নেতার অনুসরণে প্রবল বেগে দুর্গের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে; হযরত নু'মান (রা.) গুরুতর আহত হন এবং যুদ্ধজয়ের খানিক পরেই শাহাদত বরণ করেন। হযরত উমর (রা.)ও যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। যখন তাঁকে যুদ্ধজয়ের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি নু'মান (রা.)'র অবস্থা জানতে চান; তার শাহাদতের সংবাদে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত হন। যখন খলীফাকে বলা হয় যে, যুদ্ধে আরও অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছেন যাদের তিনি চেনেনও না, তখন তিনি বলেন— উমর তাদেরকে না চিনলেও সমস্যা নেই, আল্লাহ্ তো তাদেরকে চেনেন; শাহাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন!

হুযূর (আই.) **ইস্পাহান** জয় এবং সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করার পর পুনরায় **হামাযান** জয়ের ঘটনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদীর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন এবং তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন। তারা হলেন, ইন্দোনেশিয়ার

নিষ্ঠাবান মুবাল্লিগ মুহাম্মদ দিয়ানতোনো সাহেব, শহীদ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের প্রপৌত্র আমেরিকার শিকাগো নিবাসী সাহেবযাদা ফারহান লতীফ সাহেব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী প্রখ্যাত মুফাস্সের এ কুরআন হযরত মওলানা মালেক গোলাম ফরীদ সাহেব (রা.)'র পুত্র লাহোর নিবাসী মালেক মুবাশ্বের আহমদ সাহেব। হুযূর তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি, মাগফিরাত ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করে দোয়া করেন এবং তাদের পুণ্য তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও বহমান থাকার জন্য দোয়া করেন। [আমীন]

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]